আত্মদীপের
প্রজ্বলনভূমি
দীপন
বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস

আত্মদীপের প্রজ্বলনভূমি

দীপন

বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা
মার্চ ২০১০
ISSN 0975-4237

সম্পাদক
এন জুলফিকার

প্রাপ্তিস্থান

- পাতিরাম (কলেজ স্ট্রিট)
- বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন (মার্কাস স্কোয়ার/কলেজ স্ট্রিট)
- অজিতদা'র বুক স্টল, সোনারপুর স্টেশন (২নং প্ল্যাটফর্ম)
- অভিযান পাবলিশার্স, ৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
- সেল্ফ সাইন বুক স্টল, শিয়ালদহ
- সাধনা বুক স্টল, বারাসাত
- হুইলার, ৩ নং প্ল্যাটফর্ম, বর্ধমান
- বুকস্‌, শিলিগুড়ি

এন জুলফিকার
সম্পাদক

আনোয়ার হোসেন
সহ-সম্পাদক

সম্পাদকীয় দপ্তর

লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা
রোনিয়া, ঠাকুরানিবেড়িয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন-৭৪৩৩৭৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৯৭৩২৬৭৯৯৬১ ☎০৩২১৮-২৫০০৫৪
৯৪৩৪৭৫৬০৬৫
ই-মেল : deepan_jul@rediffmail.com
editordeepan@gmail.com

নগর দপ্তর

চন্দন রায়, মুদ্রাকর
১৮এ, রাধানাথ মল্লিক লেন (দোতলায়)
কলকাতা-৭০০ ০১২ ৯৮৩৬৮৩৬৬০৪

প্রচ্ছদ : ফালাহ্‌ আসাইদি-র চিত্র অবলম্বনে
অভিরুক দে
পত্রিকার নামাঙ্কন : দিগম্বর দাশগুপ্ত

মূল্য : এক শত পঞ্চাশ টাকা
দুই শত টাকা (বাংলাদেশে)
চার ডলার (অন্য দেশে)

আত্মদীপের প্রজ্বলনভূমি

দীপন

বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম মানস

সূ | চি | প | ত্র

নি য় মি ত বি ভা গ : পাঠ প্রতিক্রিয়া

স্বত্বাধিকারী এন জুলফিকার কর্তৃক রোনিয়া, ঠাকুরানীবেড়িয়া, দঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৭৬ হইতে প্রকাশিত
এবং তৎকর্তৃক নিউ রেনবো ল্যামিনেশন, ৩১এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।
বর্ণ সংস্থাপন : মুদ্রাকর, ১৮এ রাধানাথ মল্লিক লেন (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-১২।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস : ইসলামি মিথ ও মুসলিম অধিমানস

ঋতংকর মুখোপাধ্যায়

> 'ছেলেবেলায় মুর্শিদাবাদের একটি নদীর অববাহিকায় যোজন বিস্তৃত তৃণভূমিতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলাম এক বন্দুকবাজ শিকারীকে। ঝড়ে উপড়ে যাওয়া এক প্রশান্ত হিজলের ডালে সে চিত হয়ে শুয়েছিল। কাঁধ থেকে ঝুলছিল তার নিষ্ফল কার্তুজের ঝোলা। পাশে দাঁড় করানো ছিল তার প্রাচীন বন্দুক। তার গায়ের রঙ বড় মমির মতো বর্ণহীন, নিরক্ত। তার গায়ে চলাফেরা করছিল লালপোকা নীলপোকারা। আবহমানকালের নিসর্গের এক ঋজু প্রত্যঙ্গ যেন। সেদিনও আমি ঠিক এমনি করে চমকে উঠেছিলাম। সে আমার দিকে তাকালে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'আপনি পাখি মারবেন না? বিলে কত পাখি দেখে এলাম!' সেই নির্জীব বিষণ্ণ শিকারী একটু হেসে বলেছিল, 'কী হবে! আমার কিছু ভালো লাগে না!'
>
> *'এক প্রাগৈতিহাসিক শিকারী', কলেজ স্ট্রীট, সেপ্টেম্বর ১৯৮২*

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শিল্পীসত্তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এভাবেই ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর শৈশবস্মৃতির অন্তর্কথনে। যে নিরাসক্ত বৈরাগ্য মানুষকে অন্তর্মুখী করে, আর যে মানবিক চেতনা মানুষকে সামাজিক হতে শেখায়, সেই বৈপরীত্যের গূঢ় টানাপোড়েনে নির্মিত হতে পারে একজন লেখকের শিল্পীমানস। বিশেষত সিরাজের মতো কথাশিল্পী, যাঁর ছোটোবেলা কেটেছে মুসলিম-অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে, সৈয়দ বংশের খানদানের পাশাপাশি যিনি দেখেছেন দরিদ্র মুসলিম জনমানসে ধর্ম আর জীবনচর্যার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি, পরবর্তী নাগরিক যাপনেও সেই গ্রামজীবনের স্মৃতি থেকে তিনি বিচ্যুত হতে পারেননি কিছুতেই। তাই নাগরিক জীবনবোধ সিরাজের গল্পে উপন্যাসে বার বার উঠে এলেও তাঁর শিকড় রয়ে গেছে গ্রামে। সিরাজ নিজেই বলেছেন:

> '...দুর্ধর্ষ আদিম জীবনকে ভালোবাসতাম। তা পেতে চাইতাম। এবং তা পেতে গিয়ে প্রকৃতির কাছে গিয়ে পড়ি। বড় আদিম সেই জগৎ, প্রাণী ও উদ্ভিদ। পোকামাকড় ও মাটির ফাটল, উইটিবি, ছত্রাক, পাখির গু ও সাপের খোলসে ভরা সেই আদিম স্যাঁতসেঁতে মাটির সঙ্গে মোটামুটি চেনাজানা হয়ে যায়। অন্য একটা বোধ নিয়ে ফিরে আসি। বলতে শুরু করি সে এক অন্য পৃথিবী আছে, দুর্গন্ধি রহস্যময়— সেখানে রক্ত ও অশ্রুর কোন পৃথক মূল্য নেই।'

সিরাজের সদাজাগ্রত নাগরিক চৈতন্যের ভেতর এভাবেই বয়ে চলে দীর্ঘযাপিত গ্রামীণ জীবনের অন্তঃস্রোত, তার লোকায়ত পরম্পরা, জীবনবোধ— সব মিলিয়ে এক অখণ্ড যৌথস্মৃতি। রাঢ়বাংলায় মুর্শিদাবাদের সন্নিহিত অঞ্চল, যা 'বাগড়ি' নামে পরিচিত, সেখানকার কথ্যরীতি, যাপিত জীবন, লৌকিক উৎসব— এ সবকিছু তাঁর নিত্যদিনের চর্চার বিষয়। মাঝে মাঝেই সিরাজ যান তাঁর শৈশবের পৃথিবীতে। ঐ জনবৃত্তের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান অস্তিত্বের পূর্ণতা, বহুমুখিতাও; যে বহুত্বের সন্ধানে তাঁর উপন্যাসে ভিন্নতর জীবনদর্শনের কথা উচ্চারিত হয়ে চলে বারবার।

এই দার্শনিকতার সূত্রেই সিরাজের উপন্যাসে যে গ্রামজীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তার মধ্যে আঁকাড়া বাস্তবের আতিশয্যের থেকে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে মাটিঘেঁষা মানুষের হেরিডিটি, তাদের রিচ্যুয়ালস্। এমন সব প্রত্ন-বাস্তবতার অধিকাঠামোর ভেতর দিয়ে সিরাজ পৌঁছতে চান নাগরিকতার ছোঁয়া থেকে অনেক দূরে থাকা গ্রামীণ ইসলামি জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও যৌথস্মৃতির অন্তরলোকে। এই গ্রামীণ ইসলামি যৌথমানসের অনুসন্ধানে তিনি ফিরে যান ইতিহাসের অনালোকিত জগতে। উনিশ-বিশ শতকের সেই সন্ধিক্ষণে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখন ইউরোপীয় রেনেসাঁর আদলে মূল্যায়ন করতে চেয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে, ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে হিন্দুধর্মের অতীত গরিমাকে মিলিয়ে নিতে চাইছে নব্য আধুনিকতার সঙ্গে। সেই সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কিন্তু এ সবের থেকে বহু দূরে গ্রামবাংলার মাদ্রাসা-মক্তব-নির্ভর ধর্মীয় যূথবদ্ধতার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছে। তৎকালীন মুসলিম অধিমানসের এই চেহারাটি ঠিক কেমন ছিল, সে সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস প্রায় আশ্চর্য রকমের নীরব। প্রচলিত ইতিহাস ঐ সময়ে ঘটে যাওয়া ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে কৃষক বিদ্রোহের ধাঁচে। কিন্তু কোল বা সাঁওতাল বিদ্রোহের আদিবাসী চরিত্র, আর সমসাময়িক মুসলিম ধর্মান্দোলনের মধ্যে যে আকাশজমিন ফারাক আছে, সেই যৌথমানসের পৃথক শ্রেণিচরিত্রগুলিকে কৃষক বিদ্রোহের মোটা দাগে মিলিয়ে নেওয়া যে একেবারেই সমীচীন নয়, তা ইতিহাসের ঐ অভ্যস্ত পঠনে অধরাই থেকে গেছে। *অলীক মানুষ* উপন্যাসকে ফরাজি আন্দোলনের পটভূমিতে রেখে সিরাজ যখন ঐ শতাব্দী-সন্ধিক্ষণের মুসলিম মানসকে বুঝতে চান, তখন স্বভাবতই ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ করতে হয় তাঁকে— ইতিহাসের ঐ ভিন্ন পাঠের মধ্যে দিয়েই তৈরি হতে থাকে 'মাইনরিটি কাল্ট'-এর বিকল্প অনুসন্ধান।

ইতিহাসের অভ্যস্ত পঠন যে উচ্চবর্গীয়তার জন্ম দেয়, সেখানে ফরাজি আন্দোলনকে দেখা হয়েছে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়তার আবরণে, যা ক্রমশ ইংরেজবিরোধী কৃষক বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। বাংলাদেশে ১৮২০ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে এই আন্দোলন কোরান-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে ইসলাম ধর্মের কুসংস্কার ও আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। আরবি ভাষায় 'ফরাজি' শব্দের অর্থ

'ইসলাম-নির্দেশিত বাধ্যতামূলক কর্তব্য'। ফরাজি আন্দোলনের প্রবক্তা ছিলেন হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ। তিনি কোরানের একেশ্বরবাদের ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ ধনসম্পদ বা বংশমর্যাদার কোনো ভেদাভেদ রাখেননি। জমির মালিক আল্লাহ। সুতরাং জমিদারের খাজনা আদায়েরও কোনো অধিকার নেই। তাই জমিদার, রাজন্যবর্গ আর এ সবের পৃষ্ঠপোষক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে তিনি গ্রামের দরিদ্র মুসলমানদের একত্র করতে সচেষ্ট হন। ১৮৩৭ সালে শরিয়ৎ উল্লাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মহম্মদ মুসিন বা দুদু মিয়াঁর নেতৃত্বে আন্দোলন আরও তীব্রতা পায়। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষকে তিনি 'দার-উল-হারব' বা শত্রুর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি মহরম, বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে অনর্থক অর্থব্যয় এবং পির-ফকিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হন। নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকেরা তাঁর নেতৃত্বে সমবেত হতে থাকে। ফরাজি আন্দোলনকে আরও সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য দুদু মিয়াঁ তাঁর প্রভাবাধীন অঞ্চলসমূহকে কয়েকটি 'হল্‌কা'য় ভাগ করেন। প্রতিটি হল্‌কায় তিনশো থেকে পাঁচশো ফরাজি পরিবার বাস করত। প্রত্যেক হল্‌কার দেখাশোনা করতেন একজন করে খলিফা। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আন্দোলনের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠাই ছিল ফরাজিদের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে ফরাজিরা শেষ অবধি ততটা এগোতে পারেনি, তার কারণ ১৮৬০-এ দুদু মিয়াঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নোয়া মিয়াঁ ইংরেজ ও জমিদারবিরোধী কর্মসূচির থেকে ধর্মসংস্কারের দিকে বেশি দৃষ্টি দেন। আর এই সময় থেকেই ফরাজি আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

ফরাজি আন্দোলনকে এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে রেখে পড়লে তার শ্রেণিচরিত্রকে কখনো প্রাক্-স্বাধীনতা আন্দোলনের ঔপনিবেশিক মডেলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা তৈরি হয়, যে নিরিখে আদিবাসী বিদ্রোহ থেকে কৃষক বিদ্রোহ এমনকি ১৮৫৭-র বিদ্রোহকেও, একই ইংরেজ-বিরোধিতার ছাঁচে ফেলে দিতে চাই আমরা। স্বাধীনতাকে ঘিরে উচ্চবর্গীয় অসূয়ার এক স্মৃতিবাহিত পরম্পরা হয়তো-বা চরিতার্থ হয় ঐ 'পুনরাবিষ্কার'-এর আলোয়! কিন্তু এ ধরনের উচ্চবর্গীয় পঠনের আড়ালে চাপা পড়ে যায় মুসলিম অধিমানসের নিহিত পাতালছায়া। ধর্মীয়তার যে যৌথস্মৃতিকে বহন করে আত্মানুসন্ধানে রত হয়েছিল ফরাজিরা, তার সাফল্য-ব্যর্থতার কতটুকু ধরা পড়ে ইতিহাসের ঐ প্রচলিত পাঠে? সিরাজ জানেন, এতদিনের নিষ্ক্রিয় উন্নাসিকতা সরিয়ে সেই বিলুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান পেতে পৌঁছতে হবে মুসলিম মানসের উনিশ শতকীয় বীক্ষায়; তাদের বিশ্বাস-ঐতিহ্য-লোকায়ত পরম্পরার সঙ্গে অবলীন মিশে আছে যে প্রত্নচেতনার বিস্তার, তার অন্তর্গহনে তৈরি হতে পারে ইতিহাসের ঐ বিনির্মিত ভাষ্য।

পরিণত বয়সে *অলীক মানুষ* লিখতে গিয়ে সমান্তরাল ইতিহাসের সন্ধানে সিরাজ তাই সচেতনভাবেই বদলে নেন উপন্যাসের প্রচলিত আঙ্গিক। বইয়ের জ্যাকেটে মুদ্রিত বক্তব্যে

(যা সম্ভবত সিরাজের নিজেরই লেখা) এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> 'উনিশ বিশ শতকের পটভূমিতে এক মুসলিম পীর পরিবারের লৌকিক-অলৌকিক ওতপ্রোত জীবনের কাহিনী *অলীক মানুষ* উপন্যাসের উপজীব্য। দীর্ঘ প্রায় একশো বছরের এই কাহিনী বস্তুত উপস্থাপিত হয়েছে কোলাজ রীতিতে। কখনও সিধে ন্যারেটিভ, কখনও মিথ ও কিংবদন্তী, আবার কখনও ব্যক্তিগত ডায়েরি, সংবাদপত্রের কাটিং মিলিয়ে মিশিয়ে দূর-ধূসর এক সময় এবং বিস্ময়কর কিছু মানুসের বৃত্তান্ত। কিন্তু সব মিলিয়ে আভাসিত হয়েছে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম জীবনের এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটি সত্যিকার ঐতিহাসিক সনদ।'

এই অনাবিষ্কৃত প্রত্ন-ইতিহাসের স্বভূমিতে সিরাজ খুঁজে নিতে চান উনিশ শতকের ইসলামি জনমানসের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। সে পরিচয়ে বার বার ফিরে আসে যৌথপুরাণ (racial myth)। ঔপনিবেশিক শিক্ষাদীক্ষার আড়ালে গ্রামীণ মানুষের জীবনচর্যায়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিস্রোতে যা পুনর্নির্মিত হয়ে চলে। সিরাজ নিজেই বলেছেন, 'অলীক মানুষ বলতে আমি বুঝিয়েছি 'মিথিক্যাল ম্যান''(দ্র. *কোরক,* শারদীয় ১৪০০)। 'লৌকিক-অলৌকিক, প্রেম-অপ্রেম, মায়া-বাস্তবতার পরস্পর বিপরীত গতির মাঝখানে সংগ্রামরত মানুষ কীভাবে অলীক মানুষে পরিণত হয়', কীভাবে সে নিজেই হয়ে ওঠে এক আশ্চর্য 'মিথ', সিরাজ চেয়েছেন সেই ধূসর প্রত্ন-ইতিহাসের সন্ধান করতে। সেই সূত্রে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে বিস্তৃত হয় এক জাদু-বাস্তবতার আঙ্গিক, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের ক্রমাগত যাতায়াত। শিক্ষার আলো থেকে বহু দূরে নির্বাসিত সেই উনিশ শতকের মুসলিম মানসে ঘুরে ফিরে এসেছে অলৌকিক দৈববিশ্বাস; ইসলামি মিথের দূরযানী মায়াবী লোকে তারা নির্মাণ করে নিয়েছে নিজস্ব আধিভৌতিক জগৎ। আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও তা থেকে উত্তরণের কার্যকারণ খুঁজে না পেয়ে তাদের জাতিগত চৈতন্যে ছায়া ফেলেছে সাদা জিন ও কালো জিনের কুহকী মায়াজাল।

খয়রাডাঙা থেকে মৌলাহাটে যাবার সময় পথভ্রষ্ট বদিউজ্জামানের পরিবারকে উদ্ধার করতে 'উঁচু কাশবনের ভেতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল এক অসম্ভব শাদা মানুষ। দিনের উজ্জ্বল আলোয় তার শাদা চুল, শাদা ভুরু, শাদা চোখের পাতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার মুখে গোঁফদাড়ি ছিল না। সে চিৎকার করে বলল, রাস্তা ভুল হয়েছে। তারপর হাত তুলে ইশারায় এপারে সোঁতার বাঁদিকটা দেখিয়ে বলল, কিনারা ধরে চলে যান।' সেই থেকে বালক শফিউজ্জামানের বিশ্বাস জন্মেছিল, তার আব্বার অসাধ্য কিছুই নেই : 'উলুশরার মাঠে একজন কালো মানুষ বিপদে ফেলেছিল, একজন শাদা মানুষ এসে তাদের উদ্ধার করে গিয়েছিল।' সেই সাদা জিন আর কালো জিনের কাহিনি পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বহু দূর। যে পিরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদিউজ্জামান জেহাদ করে গেছেন, তার কাছেই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয় তাঁকে। ব্যাপারটা এমনই কাকতলীয় যে, ধর্মগুরুর অত

বড়ো একটা পোশাকি নাম— সৈয়দ আবুল কাশেম মুহাম্মদ ওয়াদি-উজ-জামান আল-হুসায়নি আল-খুরাসানি— যেন তাঁর অনুপুঙ্খ ইসলামি আচরণবাদের মতো ভেঙে গিয়ে দুই শব্দের 'বদু পির'-এর রূপ নিল। এইভাবে রক্তমাংসের মানুষকে কেন্দ্র করে যৌথমানসে যে মিথ গড়ে উঠতে থাকে, সেই মিথই একসময় মানুষের প্রকৃত বাস্তব সত্তাকে নিজের কাছেই অস্পষ্ট এবং অর্থহীন করে তোলে :

> 'তাঁর ফুঁ-দেওয়া জল নেওয়ার জন্য বহু দূর থেকে লোকেরা ভিড় জমাতে থাকে। জুম্মাবারে তাঁর পাগড়ি ছুঁয়ে 'তওবা' করার জন্য মসজিদের ভেতর থেকে বাইরে অবধি একটা কিউ সৃষ্টি হয়। ...তওবা অনুষ্ঠানের বহর দেখে পাগড়িটিকে অসম্ভব দীর্ঘ করতে হয়েছিল।'

বদু পিরের নিয়তি তাঁকে মহামানব বানায়। তাঁর বিবি সাইদারও মনে হয়, 'মসজিদে রাতের বেলা জিনপরি এসে খিদমত(সেবা) করছে। তাই হুজুরের আর বাড়ি আসা হয় না।' এই অলৌকিকত্বের পরিচয় বজিউজ্জমানের সত্তায় এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় যে মেজো ছেলে জন্ম-বিকলাঙ্গ মনিরুজ্জামান শাদির পর যখন একটু স্বাভাবিক হয়েছে, তখন নাকি তার বুজুর্গ আব্বার 'প্রথম আলিঙ্গনেই দেহ থেকে অতিশয় রুগ্ন কালো জিনটি পড়ি-কী-মরি করে ভেগে যায়।' এসব দৈব-আরোপণের ভার তাঁকে আজীবন বহন করে যেতে হয়। অনেক পরে বালক রফিকুজ্জামান যখন প্রশ্ন করে, 'দাদাজি! লোকে বলে আপনি মাটি ছাড়া হয়ে আসমানে উড়তে পারেন, সত্যি?' তখন বদিউজ্জামানের ক্ষণিক নীরবতা ঘিরে জমে ওঠে গভীর দীর্ঘশ্বাস। একটু পরে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ রফিকুজ্জামান, আমি দুনিয়া ছাড়া হয়ে আসমানে ভেসে আছি। ...আরও বড়ো হও। জানতে পারবে আমার তকলিফ কী?' ক্রমশ তাঁর এই বোধ জাগে, 'আমি এক অলীক ঘোড়ার সওয়ার। তার দুটো ডানা আছে। সফেদ জিনগুলান আমাকে আসমানে উঁচা জায়গায় শাহী তখ্‌তে বসাইল।' তাঁর বুক ফাটা আর্তি : 'ওহাবি হয়েও আমি কেন মোজেজা(দিব্যদর্শন) দেখি ...আমি যে সত্যি পির বুজুর্গ হয়ে পড়লাম। ...আমি মানুষ, নিতান্ত এক মানুষ।' স্বাভাবিক কামনাবাসনা-জড়িত মানুষের মতোই আসঙ্গলিপ্সা, সন্তানস্নেহ, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, সাংসারিক সুখ-দুঃখ তাঁর 'দেল'-এর ভেতর অবিরত তুফান তোলে। কখনো দলিজঘরে একলা বসে, মসজিদে ইত্তেকাফ নিলে, কখনো বা একা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে, ভাঙা পিরের সাঁকোর ওপর ভাঙা থাম দেখতে দেখতে বুকের ভেতর তোলপাড় করে ওঠে। তবু বুজুর্গ পিরের তকমা আঁটা ইহশরীর যে অলীক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছে, তার থেকে মুক্তি নেই। মৌলাহাট থেকে শিষগাঁ-হাটুলি-কাঁদরা-ভবানিপুর-মনিগ্রাম-বিনোটিয়া— সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর 'মোজেজা' পরিচয়। এইভাবেই রক্তমাংসের মানুষ গাথায়-উপকথায় কিংবদন্তির মানুষ হয়ে যান!

বদিউজ্জামান এ উপন্যাসে প্রথম থেকেই ভ্রমণশীল। যেখানেই তিনি থিতু হতে

চাইছেন, কিছুদিনের মধ্যে সেখানে তাঁর কর্তৃত্ব আলগা হয়ে পড়ছে। ফরাজি আন্দোলনের সেই অস্ত-গোধূলিতে গ্রামের মানুষজন 'হানাফি' ও 'পিরপরোস্তি'-র দলে মিশে যাচ্ছে। তাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অবিরত ঠাঁই বদল করতে হচ্ছে তাঁকে; সেই সঙ্গে স্থানান্তরে চলেছে তাঁর সংসার-পরিজন। বদিউজ্জামানের এই যাযাবরী যাপন কি শফির রক্তেও ছড়িয়ে দিয়েছিল অনিকেত সত্তার বোধ :

> 'বালক পয়গম্বর যখন রাখাল ছিলেন, হঠাৎ সেই উপত্যকায় নেমে এল দুই ফেরেশতা। তাঁকে ঘিরে ফেলল তারা। চিত করে শোয়াল। তারপর তাঁর বুক চিরে ফেলে তাঁর কলেজে থেকে অসৎ টুকরোটি কেটে নিয়ে সৎ এবং স্বর্গীয় একটি টুকরো জুড়ে দিল।'

কোরানে কথিত এই 'সিনাচাখ' বা বক্ষবিদারণের পর্বটি শফির জীবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল উলুশরার জঙ্গলে। দেওয়ান আবদুল বারি চৌধুরি, শফির বারিচাচা, সেদিন যেন 'ফেরেশতা' হয়ে নেমে এসেছিলেন শফির জীবনে। মুক্তবুদ্ধির ইংরেজিশিক্ষিত সেই মানুষ শফিকে একদা দিতে চেয়েছিলেন নাস্তিকতার শিক্ষা; ধর্মীয় অন্ধতার বাইরে মানবিকতার দিগদর্শন :

> 'আমার ওসব পীরবুজুর্গে বিশ্বাস নেই। তুমি নাস্তিক মানে বোঝো? ...নাস্তিক মানে যার আল্লাখোদায় বিশ্বাস নেই। আমি তোমাদের ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। আল্লাখোদা বলে কোথাও কিছু নেই। মানুষ হল নেচারের সৃষ্টি।'

উলুশরার মাঠে হাতির পিঠে চাপিয়ে তিনি সেদিন বুজুর্গ পিরের সন্তান শফির কলিজায় চারিয়ে দিয়েছিলেন অন্য এক জীবনের পাঠ। 'নেচার'কে অনুভব করার সেই 'গোপন পাঠ' প্রথাগত যাপনের বাইরে তাকে এনে ফেলেছিল 'স্বাধীনতা'র রাজ্যে। বারি চৌধুরি গাঢ় কণ্ঠস্বরে জানিয়ে ছিলেন : '...তোমার সঙ্গে রুকুর শাদির কথা পাকা হয়ে গেছে।' এই রুকুকে শফি স্বপ্নে দেখেছে বহু বার। ইসলামি ধর্মবিশ্বাসে যে পবিত্র বোররাখ ঘোড়া পয়গম্বরকে পৌঁছে দিয়েছিল বেহেস্তে, আল্লাতালার সামনে— শফির স্বপ্নে সেই বোররাখের সঙ্গে অবিকল মিলে যেত রুকুর মুখ। কিন্তু সেদিন বিষাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন বারিচাচার সেই 'নেচার' ক্রমশ আড়াল করে দিচ্ছিল শফির স্বপ্নে দেখা মুখাবয়ব। বারিচাচা বলে যাচ্ছিলেন :

> 'এ হতে পারে না শফি! তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। ...তোকে আমি আবিষ্কার করেছি— তোকে আমি হারাতে চাই না। শফি, তুই এখন নাবালক। শাদি দিলে তোর লেখাপড়া কিছুতেই হবে না, বাবা।'

বারিচাচার কথা শুনতে শুনতে শফির চেতনায় জেগে উঠতে থাকে অন্য এক ঘোড়ার কল্পনা। বুজুর্গপির আব্বা সাহেব, মুরিদ-মুসল্লিদের শ্রদ্ধা, পিরজাদা হবার দরুণ সামাজিক প্রতিপত্তি— সব কিছু ছাড়িয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা ঐ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার স্বাধীন উচ্ছ্বাস সেদিন শফিকে কেন্দ্রচ্যুত করে দিয়েছিল। ষোল বছর বয়সে আপাতসুখী নিরুদ্বেগ

যাপনের থেকে প্রবল বেগে বেরিয়ে যাওয়ার বহির্মুখী টান যেন চিরতরে মুক্তি দিয়েছিল তাকে। বাড়িতে শাদির জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত মুহূর্তে সে পালিয়ে এসেছিল হরিণমারায়। এই ঘটনা শফির বাকি জীবনকে ওলটপালট করে দেয়। তার অবর্তমানে মেজো ভাই অর্ধমানব বিকৃতকাম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রুকুর। রুকুর জীবনে এ এক রকম অসহায় মৃত্যুই বলা চলে। কিন্তু মুসলিম অন্তঃপুরে অশিক্ষিত অপরিণত এক গ্রাম্য কিশোরীর মন কে-ই বা বুঝতে চেয়েছে? উনিশ শতকের সেই ফরাজি রক্ষণশীলতায় নারীজন্মের প্রতিবাদহীন অসহায় যন্ত্রণাকে নীরবেই বহন করে চলে সে :

> 'যখন-তখন একটা জন্তু-মানুষের কামার্ত আক্রমণ, এমনকি রজঃস্বলা অবস্থাতেও রেহাই নেই। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে রুকু তার অবশ শরীর রেখে পালিয়ে যায়— পালাতেই থাকে, দূরে— বহুদূরে।'

অন্য দিকে শফিও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় প্রবল আক্রোশে দগ্ধ হতে থাকে; নিজেকে, নিজের পরিপার্শ্বকে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে চায় :

> 'ইচ্ছে করছিল সবকিছুতে লাথি মারি। গুঁড়িয়ে ফেলি নবাবি ঘরের আসবাবপত্তর। ছুটে বেরিয়ে যাই একটা কালো রঙের ঘোড়ার পিঠে চেপে— ছুটতেই থাকি ক্রমাগত দিনভর রাতভর— আমৃত্যু।'

পরবর্তী জীবনে তার মনে এই প্রশ্ন বহুবার তোলপাড় করেছে, কেন সে সেদিন অস্বীকার করেছিল রুকুকে? চল্লিশ বছর পরে ফাঁসির সেলে বন্দি শফির উপলব্ধি হয় 'তখন আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন। বারিচাচাজি এবং রুকু। আমি ভাবছিলাম কার দিকে যাব— কে আমার প্রিয়?' যে আত্মদ্বন্দ্বে শফি শেষ পর্যন্ত বারিচাচার দিকেই মুখ ফেরায়, যে নিষ্ঠুর সত্যে দুই কাঙ্ক্ষিত জনের মধ্যে একজনকে পেতে গিয়ে অন্যকে বর্জন করতে হয়, সেই না-পাওয়া মানুষটির জন্য অবিরত গোপন কান্না, নিষ্ফল ক্রোধ কি পর্যবসিত হয়ে যায় সমস্ত পৃথিবীর প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণায়? বুজুর্গপিরের প্রকাণ্ড ছায়ার বাইরে এসে প্রকৃত রোদ্দুর ডানায় মেখে নেবে বলে শফি যে বারিচাচার হাত ধরে পৌঁছতে চেয়েছিল 'নেচার'-এর স্বাধীনতালোকে, শেষ পর্যন্ত শফির জীবনে তা এক প্রকাণ্ড 'নাস্তি' হয়ে আছড়ে পড়ে। শফি যখন শুনেছিল রুকুর সঙ্গে তার মেজো ভাইয়ের শাদি দিয়েছিল তারই প্রতাপান্বিত পিতা, তখন থেকেই কি মৌলবাদী পিতার সঙ্গে ধর্ম তথা জীবনবোধের দ্বন্দ্বে শফি ক্রমে ঝুঁকে পড়তে থাকে আত্মনাশী নৈরাজ্যবাদের দিকে? তার শরীরের অন্তর্গত পূত পিতৃরক্তকেও কলঙ্কিত করতে চায় সে উদ্দাম যৌনতায়, অবিরাম হত্যালীলায় মেতে উঠে!

উপন্যাসের মুখবন্ধে এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর যে কয়টি পঙ্‌ক্তি উল্লিখন হয়ে ধরা দেয় মুস্তাফা সিরাজের লিখনে, তার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে ঘৃণা কীভাবে জন্ম দেয় এক ঘাতকসত্তার :

'Hatred is one of the passion that can be master a life, and there is a temperament very prone to it, ready to see life in terms of vindictive melodrama, ready to find stimulus and satisfaction in frightful demonstrations of 'justice' and 'revenge''.

প্রকৃত সৌন্দর্য, যা স্বভাবত প্রাকৃতিক, সেই সৌন্দর্য-আগ্রাসী ক্ষুধা আত্মসাৎ করতে চেয়েছে শফিকে। আসমা-সিতারার অবৈধ জৈব সান্নিধ্য তাকে আনন্দ দেয়নি। বরং এক অতৃপ্তির বিষণ্ণতায়, সৃষ্টিনিয়মের অসহায় আত্মযন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকে সে:

'পুরুষের জীবনে ওই যেন কঠিন নির্বাসনের কষ্ট-কাল! নারীর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে নিরন্তর নারীর সঙ্গে স্পর্শে-সাহচর্যে বেড়ে উঠতে উঠতে তারপর সে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে অথবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় দূরে। নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট তাকে অচ্ছুত করে ফেলে। নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে প্রিয় এক জগৎ, এবং নির্বাসিতের মতো, অচ্ছুতের মতো, তারপর দূরে সরে থাকা। আবার প্রতীক্ষায় থাকা, কবে ফিরবে প্রিয়তম ঘরে? কবে ফিরে পাবে সে নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট এবং নারীর জরায়ু— শরীরের পৌরুষের যৌবনের রক্তমূল্য দিয়ে সকল পেশীর শক্তি দিয়ে হবে তার প্রত্যাবর্তনজনিত পুনরভিষেক? কবে সে ফিরবে পুরনো কোমল ঘরে?'

বিদ্যাচর্চা, ব্রহ্মবাদ, মননচর্চা কিছু দিয়েই এই অপ্রাপ্তি আর নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার কোনো 'Justice' খুঁজে পায় না শফি। তার মধ্যে জেগে ওঠে তীব্র 'প্রতিশোধস্পৃহা'(revenge)। এত বড়ো পৃথিবীতে কোথাও তার বাসভূমি মেলে না। স্বামীজি সংঘে যোগদান, কিংবা বৌদ্ধ দার্শনিক পকুধ কচ্চায়নের মতাদর্শে অনুরাগ— কিছুই তাকে সমতা দান করতে পারে না। মৃত্যু-হত্যায় রক্তাক্ত এই ঘাতক মানুষটির একদিন নাম হয়ে যায় ছবিলাল। পৃথিবী দুঃখময়, পার্থিব শরীরে বেঁচে থাকা এক কঠিন নির্বাসন— তাকে বাসযোগ্য করার জন্য সংগ্রাম করতে চেয়েছিল শফি, কিন্তু বুজুর্গ পিতার প্রায় সম্পূর্ণ উল্টো পথে হেঁটে সেও হয়ে উঠল 'অলীক মানুষ'! এই উলটপুরাণের অন্তর্বাস্তবতা সময় ও প্রজন্ম-ব্যবধানেও মোছে না, লোকায়ত যৌথস্মৃতিতে এভাবেই অবিরত মিথের জন্ম হতে থাকে।

পুরাণ, লোককথা, পরাবাস্তব, ধর্মীয় বিশ্বাস— সব মিলিয়ে প্রত্ন-ইতিহাসের গভীরে যে মুসলিম মানসের অধিগঠনকে সিরাজ ছুঁতে চান, সেই অন্বেষার যাত্রাপথ ক্রমশ বিস্তৃত হয় *অলীক মানুষ* থেকে *স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান, রেশমির আত্মচরিত, মায়ামৃদঙ্গ* কিংবা *জানমারি*-র আধুনিক দিগ্‌বলয়ে। রাঢ় বাংলায় মুসলিম জনসমাজের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে *স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান*-এর আখ্যানবৃত্ত। উপন্যাসের সূচনায় সিরাজ বলেছেন:

'এ দেশে মুসলিম সমাজেও একসময় বর্ণ-জাতপাত প্রথা ছিল। এখনও কিছু-কিছু আছে। বিশেষ করে রাঢ় বাংলার তিনটি জেলা বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে

উচ্চবর্ণের মুসলিমরা 'মিয়াঁ' নামে পরিচিত। ফার্সি 'মিয়ান' শব্দের আক্ষরিক অর্থ মধ্য। সামাজিক অর্থে মধ্যবিত্ত। 'মিয়াঁন' শব্দ এদেশে হয়ে গেছে মিয়াঁ বা মিঞা। রাঢ়ে মুসলিম সমাজের এই বিশেষ শ্রেণীর ব্যাপক বিপর্যয়, পতন এবং ছত্রভঙ্গ দশা সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোনও কোনও উপন্যাস বা গল্পে উল্লেখ করেছি। সমকালে এই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান বর্তমান উপন্যাসের পটভূমি।'

তবু সিরাজ শেষ পর্যন্ত একে প্রেমের উপন্যাসই বলতে চান। তাঁর আর্জি 'সহৃদয় পাঠক যেন এটিকে প্রেমের উপন্যাস গণ্য করেন।' দুই মেয়ে আফসানা ও রেবেকাকে নিয়ে মবিন খোন্দকারের সচ্ছল পরিবার। টেনেটুনে বি.এ. পাশ করার পর বড়ো মেয়ে আফসানার বিয়ে হয়ে যায় এক শ্যামবর্ণ বেঁটেখাটো গুঁফো সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। মা রোকেয়ার জামাই পছন্দ ছিল না। বরং তাঁর সুন্দরী ফর্সা মেয়ের জন্য মানানসই পাত্রের সম্বন্ধ এনেছিলেন ভাই ফজু মিয়াঁ। কিন্তু গ্রামীণ মুসলিম পরিবারে পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বে রোকেয়ার ইচ্ছার কথা মনেই চেপে রেখে দিতে হয়। কেননা খোন্দকারের নজর ছিল উচ্চ খানদানের দিকে। নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে তিনি বিশ্বাস করেন, ইসলাম যদিও বলে খোদার চোখে সব মানুষ সমান; কিন্তু খোদার চোখ আর মানুষের চোখ কি এক হতে পারে! সত্তরে পৌঁছে তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তা ছোটো মেয়ে রেবেকাকে উপযুক্ত খানদানে শাদি দিয়ে যেতে পারবেন তো? ফজু মিয়াঁর কাছে তাই একান্তে প্রতিশ্রুতি চান তাঁর বর্তমানে রুবি যেন খানদান পায়। এই সংকল্পে তিনি এতটাই বদ্ধপরিকর, যে নইলে তাঁর রুবি চিরকাল আইবুড়ো থেকে যাবে, সেও ভালো।

এ উপন্যাসে খোন্দকার এক প্রজন্মের প্রতিনিধি, যাঁর মধ্যে বংশগরিমা এবং ইসলামি কৌলীন্য প্রবলভাবে বহমান। দেশভাগের বিচ্ছেদরেখায় মুসলিম জনসমাজে মিয়াঁ-খানদানির সবকিছুই যে ভেঙেচুরে গেছে ভেতরে ভেতরে, তা বোঝেন তিনি। 'ছুটকো-ছাটকা সব খানদান যারা মাটি কামড়ে পড়ে রইল, তাদের কী অবস্থা! ওলু মিয়াঁর পোতারা কেউ রিকশা চালায়, দর্জিগিরি করে। ফতে মিয়াঁর বাড়ির মেয়েরা বিড়ি বাঁধে।' তবু এই রক্ষণশীল মুসলিম-ঐতিহ্যের ছিন্নমূল সত্তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চান তিনি। এ উপন্যাসের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে এই শ্রেণিচ্যুতির দ্বান্দ্বিক অভিঘাত। ফজু মিয়াঁ অপেক্ষাকৃত আধুনিকমনস্ক, তিনি মনে করেন, রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে থেকে লাভ নেই। কোনো স্মৃতিতাড়িত মুহূর্তে অবশ্য তাঁর চোখেও ঝলসে ওঠে অতীত বংশগৌরবের ছবি : 'আমি খানবাহাদুরের খানদান। আমার দাদাজি খানবাহাদুর মহিনুদ্দিন খান চৌধুরি লাটসাহেবের সঙ্গে বাঘ মারতে যেতেন।' এই ঔপনিবেশিক রীতিদাসত্ব অবশ্য এক হিসেবে হৃতসর্বস্ব মধ্যবিত্তের অতীত স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

খানদানের প্রতি খোন্দকারের তীব্র আকাঙ্ক্ষার সমান্তরালেই সিরাজ এ উপন্যাসে নিয়ে আসেন এম.এ. পাশ স্কুলশিক্ষক সানুর দাম্পত্য-সম্পর্কের বিন্যাসকে। স্ট্রাগল করে বড়ো

হওয়া সানু একদা ছিল রুবির গৃহশিক্ষক। রুবির নিরুচ্চার ভালোবাসাকে সেভাবে অনুভব করতে পারেনি সানু। অথচ উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে কিছু জল্পনাও চালু ছিল গ্রামের অন্দরমহলে। ঘনিষ্ঠতার এই খবর হয়তো কানে এসেছিল খোন্দকারের। এরপর থেকে সানুর বদলে রুবিকে পড়ানোর কাজে নিযুক্ত হল এক শিক্ষিকা। ইতিমধ্যে সানুর বিয়ে হয়ে গেছে কুতুবপুরের প্রভাবশালী মীর বংশে। সেই সূত্রেই তার জুটে গিয়েছিল কুতুবপুর হাইস্কুলে মাস্টারির চাকরি। সানুর বউ রেজিনা ম্যাট্রিক পাশ। শ্বশুরের খানদানে যত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সানু, ততই অর্থ-বিত্ত-কৌলীন্যের চাপে বিপন্ন বোধ করতে থাকে। রেজিনা বাধ্য করে সানুকে টিউশন ছাড়তে:

> 'আমার আব্বার প্রেসটিজ নেই? ...মাসে অতগুলো টাকা মাইনে পাচ্ছ। এদিকে আম্মা মাসে মাসে সরু চাল ঘি কত কিছু পাঠিয়ে দেন। আব্বা নিজের চিমনিভাটা থেকে দশ হাজার ইট পাঠিয়ে দিলেন। আরও দশ হাজার এসে যাবে। তুমি কাল থেকে টিউশনি করবে না।'

সানুকে টিউশনি ছাড়ানোর পিছনে রেজিনার পিতৃকৌলীন্যের থেকেও বড়ো কারণ ছিল রুবির সঙ্গে সানুর সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ। এই সংশয় আর অর্থগৌরবের যুগ্মতায় ক্রমশ সানুর জীবনে নেমে আসে দাম্পত্য-সম্পর্কের তীব্র ভাঙন-মুহূর্ত। সানুর মনে হয়। 'হাশিম মীরের শ্রেণীবদ্ধ চৌকো লালচে দশ হাজার ইট একটার পর একটা ছুটে এসে' তাকে ঢেকে ফেলছে। আর সেই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুহূর্তে যেন 'লাল বালা পরা দুটি কোমল হাত ক্রমে একটি করতল হয়ে ভেসে আছে। বিপজ্জনক ধ্বংসপ্রবাহের মধ্যে শান্ত এক প্রার্থনা হয়ে আছে।' রুবি তার স্যারের কাছে যে স্বর্ণচাঁপার চারা চেয়েছিল, তার তীব্র মদিরতা উপশম হয়ে উঠতে থাকে সানুর কাছে। আগে বোঝেনি, তার মগ্নচৈতন্যের সবটা জুড়ে যে জীবনচরিত এতদিন গাঁথা হয়েছিল, তা এক ছাত্রীর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় গড়া 'স্যারের জীবনচরিত'। সানু অনুভব করে 'কীভাবে ক্রমে ক্রমে খানদান বাড়ির এক কিশোরীই তাকে স্যার করে ফেলেছিল— আর কেউ নয়, আর কেউ এই কাজটা করতে পারত না। সেই কিশোরী এক দক্ষ রূপকার। সে-ই একজন স্যারের ভাস্কর্য গড়ে তুলেছিল।' একদিন রেজিনার বিত্ত কৌলীন্যের নাগপাশ থেকে চিরতরে মুক্তি পায় সানু। বনগাঁর একটা স্কুলে মাস্টারি পেয়ে যায় সে। উপন্যাসের শেষে স্বর্ণচাঁপা পল্লবিত হয়ে ধরা দেয় রুবির জীবনে। অবশেষে 'তার স্বর্ণচাঁপা তার কাছে মাটি চাইতে এসেছে।' হাজারো যন্ত্রণার দগ্ধ ক্ষত পেরিয়ে রুবি তাকে গভীর মগ্নতায় আপন করে নেয়।

রেশমির আত্মচরিত রেশমির স্বাধীন নিঃসঙ্গ বেঁচে থাকার কাহিনি। সচ্ছল বনেদি মুসলিম পরিবারে তার বড়ো হয়ে ওঠা। বাবা কাজি মোতাহার হোসেন নামজাদা উকিল; মা তহমিনা রক্ষণশীল পর্দানশিন মহিলা। রেশমি অবশ্য তার মায়ের মতো অন্তঃপুরে দিন কাটায়নি। বাবার ইচ্ছা আর প্রেরণায় সে শহরে কলেজে পড়েছে; বি.এ. পাশ করেছে। তবু

অন্তর থেকে স্বাধীন হয়ে ওঠা রেশমির জীবনের এই একুশটা বছরেও সেভাবে সম্ভব হয়নি। বিশেষত ইদানীং সে বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠায় স্বাধীন চলাফেরার ওপরেও মায়ের বিধিনিষেধ চেপেছে অনেকটাই। রেশমির এই নিস্তরঙ্গ যাপনে বিপুল তরঙ্গের অভিঘাত এনেছিল পিতৃবন্ধু একদা বিপ্লবী চিনু সামন্ত— তার চিনুকাকা। কলেজে পড়ার উত্তাল দিনগুলিতে রাজনীতির অলিন্দে বহুবার নাম শোনা সেই মানুষটি কোনোদিন সরাসরি যে এসে পড়বে তাদের নির্জনতায় ঘেরা বাড়ির চৌহদ্দিতে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি রেশমি। চিনুকাকার অস্তিত্বের মধ্যেই যেন রয়ে গেছে নিয়মভাঙার মন্ত্র। সেই টানে রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের প্রচলিত নিয়মতন্ত্রের অজান্তে অনেক রদবদল ঘটে গেল। রেশমির আত্মকথনে উঠে আসে সেই পরিবর্তমানতার ইঙ্গিত। এতদিন প্রথা ছিল 'দলিজঘরে কোন অতিথি এলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে না। আমি নিজে থেকেই যাই, তাতে মায়ের চাপা আর্তনাদ শুনে মনে হবে, সাংঘাতিক একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে।' পারিবারিক যূথবদ্ধতার যে পৃথিবীতে রেশমির মায়ের অবস্থান সেখানে ইসলামি অন্ধবিশ্বাস বার বার ছায়া ফেলে যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, আল্লা ইনসান আর জিন সৃষ্টি করেছেন। ইনসান 'নাকি মাটি দিয়ে গড়া। তাই মানুষের মাটির দেহ। জিনরা কিন্তু আগুন দিয়ে তৈরি।' আধিভৌতিক প্রত্নকাঠামো দিয়ে গড়া সেই জগতে অনেক অন্তরাল, অন্ধকার। চিনুকাকার আগমনে এতদিনের সেই আড়াল শুধু ভেঙে গেল তাই নয়, প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বললেন, 'রেশমি! এস, তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, সত্যি তুমি রেশমি কি না।' রেশমির কাছে অভাবনীয় এই ঘটনা। তার নিজের কথায় :

> 'আমি মুসলিম মেয়ে। আমার অঙ্গ স্পর্শ করা যায় না, শুধু স্বামী বাদে। আমি সাবালিকা হওয়ার পর বাবাও আমাকে স্পর্শ করেন না। কিন্তু এও যেন একটা বিপ্লব। আমার কাঁধে পরপুরুষের হাত। আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। মনে মনে ভাবছি, উনি তো আমার বাবার বন্ধু। আমার কাকু বলে ডাকার নিয়ম। অথচ উনি যে পরপুরুষ, এটা ভুলে যাই কী করে? আমার দ্বিগুণ বয়সী এক পুরুষ আমার কাঁধে যে হাতটা রেখেছেন, সেই হাত ...একজন বিপ্লবীর হাত। কিংবদন্তি নায়কের এই হাত। কী অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল আমার জীবনে!'

চিনুকাকুই রেশমির নারীজীবনে প্রথম দেখা পুরুষ। বাবা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া জীবনে কোনো বাইরের পুরুষ মানুষকে সে এত কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখেনি। দেখতে ইচ্ছেও করেনি। তার মনে হয় :

> 'হোন না বাবার বন্ধু, এই প্রথম একজন বাইরের পুরুষ মানুষের খুব কাছে চলে এসেছি এবং সেই পুরুষ মানুষটি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। অত্যন্ত নতুন মানুষ তো বটেই, উপরন্তু রহস্যময়। তাঁর জীবনটাই অন্য রকমের। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি মুসলিম নন, হিন্দু!'

চিনুকাকুই রেশমির ধর্মবোধ, ঈশ্বরবিশ্বাস— সবকিছুকে নতুনভাবে নির্মাণ করে দিচ্ছিলেন। ইসলামে নিরাকার ঈশ্বর আর হিন্দুধর্মের বহুদেববাদের ধারণাকে যখন তিনি সমান্তরালে এনে বলেন :

> 'তোমাদের সেমেটিক ধারণায় ঈশ্বর পার্সোনাল গড। হিন্দু কন্সেপশন অন্যরকম। ব্রহ্মা— তিনি নিরাকার। আবার দেবদেবীরা সাকার। তবে ভেবে দেখ, যিনি অন্নপূর্ণা, তিনিই নাকি সর্বনাশা মহাকালী। ...মেয়েদের সম্পর্কে ভাবনাটা ভারি আশ্চর্য না?'

এই অনুভূতি রেশমির অন্তশ্চেতনায় এক অনাবিষ্কৃত সত্তার উন্মোচন ঘটায়। হিন্দু দেবদেবীর ব্যাপারটা আগে কখনো সে এমন করে ভাবেনি। বিশেষত 'সর্বনাশী মহাকালী' কথাটা তার চেতনায় আছড়ে পড়েছিল। মোতাহার হোসেনের পারিবারিক রক্ষণশীলতা খানদান সব কিছুকে ভেঙে উপন্যাসের শেষে যখন আত্মস্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাবে রেশমি, তখন রেশমির সংলাপে আবার ফিরে আসবে সর্বনাশী মহাকালীর কথা : 'মেয়েদের মধ্যে যে সর্বনাশী মহাকালীও আছেন'। সেই বিপুল আত্মশক্তির কাছে অসহায় ভেঙে পড়বে প্রবল পুরুষতন্ত্র।

চিনুকাকা ছাড়া যে দু'জন পুরুষ রেশমির জীবনে প্রায় একই সঙ্গে এসেছিল, সেই রাজাদা আর গোলাম কাদের— উভয়েই ম্লান হয়ে গেছে রেশমির প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে। চিনুকাকুই রেশমিকে বলেছিলেন, প্রত্যেক বিপ্লবীর মধ্যে এক প্রেমিকসত্তা বাস করে, অথবা অন্যভাবে দেখলে 'সত্যিকার প্রেমিকই সাচ্চা বিপ্লবী'। রেশমি ভেবেছিল— 'বিপ্লব জিনিসটা কী? প্রেমের জন্য, মুক্তির জন্য বিপ্লব। প্রেমেই কি মুক্তি?' রাজাদাকে যে ভালোবেসেছিল রেশমি, সেই প্রেমিকের মধ্যে কোনো আত্মত্যাগ দেখতে পায়নি সে। রাজাদার কথা শুনেছিল চিনুকাকুর মুখেই। কিংবদন্তির নায়কটি সেদিন নিজেকে সাধারণ মানুষে পরিণত করে রাজাদাকে মুহূর্তে অসাধারণ করে তুলেছিলেন। কিন্তু আর্টিস্ট রাজাদার মধ্যে সেই মুক্ততা কোথায়? রেশমির পোট্রেট এঁকে দিয়ে, সম্পর্কের প্রতি সম্মতি জানিয়েও, সে সরে গিয়েছিল রেশমির জীবন থেকে। গোলাম কাদেরের সঙ্গে বিবাহ-প্রস্তাব এনেছিলেন রেশমির বাবা। আলাপ-পরিচয়ের পর রেশমির ভালো লেগেছিল কাদেরকে। কিন্তু ভালো লাগা আর ভালোবাসার মধ্যে যে ব্যবধান অনেক, সেই সত্যে যখন সে পৌঁছল, তখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। গোলাম কাদেরের সঙ্গে শাদির আয়োজন সম্পূর্ণ; বরযাত্রীও এসে গেছে। শাদির উকিল ইমামসাহেব প্রথা মতো নিকাহের 'ইজাব'(প্রস্তাব) দিয়েছেন। রাজাদা'র প্রতি ভালোবাসায় সেদিন নিকাহের 'ইজিন'(সম্মতি) দিতে পারেনি রেশমি। তারপর অবশ্য সেই রাজাদাও আর আসেনি। আর্টিস্টের কেরিয়ার আর অ্যাম্বিশন রেশমিকে তখন অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যান রেশমিকে অন্তর থেকে অনেকখানি স্বনির্ভর করে তুলেছিল। ব্যক্তিত্বের এই উদ্বোধনে এককভাবে বেঁচে থাকার শক্তি পেয়েছিল সে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা'কে নিয়ে তার নিঃসঙ্গ যাপনের মাঝে কোথাও হয়তো সুপ্তভাবে

বেঁচে ছিল রাজাদা'র শিল্পীসত্তার প্রতি অন্তঃশীল শ্রদ্ধা-অনুরাগ। তার আঁকা পোর্ট্রেট ধূসর স্মৃতির মতো টাঙানো ছিল অন্দরমহলে। ব্যর্থ প্রণয়ের সেই অভিজ্ঞানটুকুও একদিন এক লহমায় মিথ্যে হয়ে গেল, যখন চিনুকাকু রেশমিকে কিছু না জানিয়েই, রাজার কাছে বিবাহের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি নিয়ে গেলেন এবং জানতে পারলেন, ইতিমধ্যেই একটি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে সে। রেশমির কাছে সেই মুহূর্তটি পরম বেদনার, চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গের মুহূর্ত। সে স্বপ্নভঙ্গ যতটা রাজাদাকে না-পাওয়ার জন্য, তার থেকে অনেক বেশি চিনুকাকুর বিপ্লবী সত্তার পরাজয় দেখে। যে চিনুকাকু একদিন রেশমির মগ্নচেতনার অনেক রুদ্ধ অর্গল খুলে দিয়েছিলেন, তিনি যে এভাবে আপোষের পথে হাঁটবেন, তা রেশমির কাছে অকল্পনীয়। রেশমি তখন চিনুকাকুকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, 'আর একটা কথা নয়। বেরিয়ে যান। ...আর কখনও এ বাড়ি আসবেন না।' ব্যর্থ সম্পর্কের অগ্নিদাহ থেকে বেরিয়ে, আদর্শবান বিপ্লবী চিনুকাকুর পরিণামী আত্মক্ষয় বুকে নিয়ে, নিরালম্ব অথচ স্বাধীন এক ভবিষ্যতের দিকে রেশমির একক পথ চলাতেই উপন্যাসের সমাপ্তি। মুসলিম পরিবারে প্রতিবাদী নারীসত্তার এই প্রবল স্ফুরণে *রেশমির আত্মচরিত* নিঃসন্দেহে সিরাজের মুক্তচিন্তার প্রতীক হয়ে ওঠে।

মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাসে প্রত্যক্ষত মুসলিম মানসের পরিচয় পাওয়া যাবে না। তবে বহুস্তরীয় অন্তর্গঠনে উঠে আসা এই উপন্যাসে সিরাজ দেখাতে চান দরিদ্র অন্তেবাসী মানুষজনের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির আদানপ্রদানে কীভাবে নির্মিত হয় লোকায়ত জীবনচর্যা এবং গৌণধর্মের আঞ্চলিক ভিত্তি। অনেকে এই উপন্যাসকে সিরাজের আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলতে চান। আলকাপ-জীবনের দিনযাপন ও লৌকিক অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ তাপে উষ্ণ হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসের আখ্যানবৃত্ত। ১৯৫০-৫৬ পর্যন্ত ছ-সাত বছর সিরাজ নিজে জড়িত ছিলেন আলকাপ দলের সঙ্গে। তাঁর কথায় :

> 'প্রথম যৌবনের ছ'সাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দামি আর সম্ভাবনাপূর্ণ ছ'সাতটা বছর— তার মানে, খুব কম করে ধরলেও আড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গে সৌন্দর্য আর যন্ত্রণায় কেটে গেছে, ...তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।'

পদ্মা-গঙ্গা-অজয়-ময়ূরাক্ষীর যোজনবিস্তৃত অববাহিকায় গ্রামগঞ্জ-হাটমেলায় এই ধ্রুপদি লোকনাট্যকে ঘিরে যে আশ্চর্য লোকজীবন ছড়িয়ে আছে, তার কুশীলবরা নামে-স্বনামে উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। সমাজের মূল স্রোত থেকে বহু দূরে অনাদরে-অবজ্ঞায়, সাধারণের তীব্র কৌতূহলে কেবল লোকশিল্পকে আঁকড়ে বেঁচে আছে যে অর্ধনারীশ্বর মানুষজনেরা, তাদের যাপনচিত্র ডকুমেন্টেশনের মতোই পরিবেশিত হয়েছে এখানে। সিরাজ দেখেছেন, 'মেয়েদের হৃদয় এবং মুখমণ্ডলবিশিষ্ট তরুণ পুরুষের শরীর কিংবদন্তির গ্রামপরিদের

দ্বারা' কীভাবে আক্রান্ত হয়; তাদের ঘুমঘোরে গ্রামপরিরা রেশমি শিকড়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ডিম পেড়ে রেখে যায়। শরীরী সংরাগে, ব্যর্থ প্রণয়দাহে অর্ধনারীশ্বর 'তরুণ পুরুষ অবাঞ্ছিত ভালবাসার অবতারণা করে। এই অসবর্ণ ভালবাসা বড় বিপজ্জনক'; অথচ তার তীব্র সম্মোহনী মায়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন লেখক স্বয়ং।

উপন্যাসের নায়ক সাঁওতাপাড়া আলকাপ দলের সনাতন কুমার রায় বা সনাতন মাস্টার, সিরাজের এক অন্তরসত্তা। সে এক সময় বাঁশি বাজাত, হাবোল গোঁসাইয়ের কাছে গানও শিখেছে। এছাড়াও উপন্যাসে আছে বিশালদেহী 'মেনেজার' আমির আলি, হারমোনিয়াম-বাদক কন্দু বা কাদের আলি প্রভৃতি অগণন লোকশিল্পীর কথা। এরা প্রত্যেকেই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট চরিত্র। এই লোকায়ত বৃত্তের মধ্যে থেকেও সনাতন ক্রমশ একা হয়ে যেতে থাকে। তার চারিদিকে নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাস, বিচ্ছিন্নতার অপ্রতিরোধ্য দেওয়াল। সুবর্ণ-র ভালোবাসা তার চেতনাকে আলোড়িত করে, কিন্তু একাকিত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। 'সুবর্ণ তাকে ভালবাসে! ...সুবর্ণ যদি মেয়ে হত, কোন মানে খুঁজে পাওয়া যেত। একজন পুরুষ আর একজন পুরুষকে ভালবাসে।' অথচ সে 'সুবর্ণকে তো আজ অব্দি কোনমতে পুরুষ ভাবতে পারে না। ভুল জেনেও চোখে মায়া ছড়িয়ে থাকে— যেন সদ্য যৌবনবতী কিশোরী মেয়ে!' ঐ 'ভুল' দিয়েই সুবর্ণর সঙ্গে সনাতনের প্রথম পরিচয়। সোনাভাঙার মেলার আসরে কণ্ঠের মোহিনী জাদুতে তাকে মেয়ে ছাড়া আর কী-ই বা ভাবতে পেরেছিল সে? 'ওর নাচগানের মধ্যে কাকে যেন খুঁজে পাচ্ছিল। ...নিশুতিরাতে মাঠের মধ্যে একা বাঁশি বাজাতে বাজাতে তার সাধ হত, আকাশ থেকে পরি নামুক! সেই পরিকে টের পাচ্ছিল হয়ত।' সেই থেকে সুবর্ণ ছায়ার মতো সনাতন মাস্টারের সঙ্গে থেকেছে। 'সেই ভাল লাগা, ভালবাসা! ...মনের মধ্যে কে যেন মাথা কোটে, ভুলে ভরে থাক, ভুলেই জীবনটা ডুবে থাক।' এই মিথ্যেটুকুকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চায় সনাতন। উপন্যাসের শেষে সুবর্ণকে সঙ্গে নিয়েই সাঁওতাপাড়া ছেড়ে সে চলে যেতে থাকে।

> 'কোথায় যাবে কিছুই ভাবে না। শুধু মনে হয়, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়। আর যেতে যেতে বিহ্বলতায় হঠাৎ থেমে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। ...এই আবেগ, এই ভালবাসা, এই শরীর ছোঁয়া আবেশ— মায়া নামে নারীর উদ্দেশে। যে নারী নটী— যার ছায়া পড়েছে এক কিশোর পুরুষদেহে, যে ছায়া সারাবেলা নাচে। সেই ছায়াকে নিয়েই যত খেলা। যত পালাগান, কান্না; সুখ ভালবাসা।'

দুটি পুরুষ শরীরের এই ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে অনন্ত আকাশ থেকে ভেসে আসে ঝাঁকসার গুরু অনিরুদ্দিনের সতর্কবাণী : 'হুশিয়ার! হুঁশিয়ার! তোমার সামনে মায়া। তার পিছনে ভয়ঙ্কর জাহান্নাম!' তবু তারা কেউ বিচলিত হয় না। অমর্ত্য মায়ায় জড়িয়ে, তাকে নিয়েই মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলে যায় সনাতন— সব পাপ, নিষিদ্ধতা ছাড়িয়ে আর এক মানবজন্মের প্রত্যাশায়!

জানমারি উপন্যাসে সিরাজ ইতিহাস, পুরাবৃত্তকে মিলিয়ে দেন আঞ্চলিকতায়; গড়ে তোলেন আধুনিকতার এক ভিন্ন দিগ্‌বলয়। সেখানে ক্ষমতাদখলের রাজনীতি মানুষকে সন্ত্রাসের পৃথিবীকে নির্বাসিত করে, ক্ষমতাবানদের রাজনৈতিক চরিতার্থতায় দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ ঘাতকে পরিণত হয়, মেতে ওঠে পারস্পরিক হনন-উল্লাসে। এইভাবে ভয়, বীভৎসতা, মৃত্যু মিলেমিশে তৈরি করে এক বধ্যভূমি,— 'জানমারি'।

মহকুমা শহরমুখী পিচ রাস্তার দু'পাশের খণ্ডভূমি সেই সুদূর ইংরেজ আমল থেকেই ছিল 'ঐতিহ্যসম্মত নোম্যানস্‌ল্যান্ড'—

> 'এই প্রাক্তন নোম্যানস্‌ল্যান্ডে দাঁড়ালে দক্ষিণে মুসলিমপল্লী চক্ষুগোচর হয় ...ওই পল্লীটির এদিকাংশে ডাঙ্গাপাড়া, ওদিকাংশে নামুপাড়া, এভাবে প্রলম্বিত। কোন্‌ অতীতকাল থেকে দুই পাড়ার দুই তালেবর ব্যক্তির মধ্যে পুরুষানুক্রমে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের মূল মাটি নয়। এটাই আশ্চর্য, নারীও নয়। সে কি প্রভুত্ব? এও হয়তো অর্ধসত্য। ...কেউই এই হেঁয়ালির জট ছাড়াতে না পেরে Hegemony এই ইংরেজি শব্দটির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ...ডাঙ্গাপাড়া-নামুপাড়ার এক্সট্রা-অর্ডিনারি মাত্রাপ্রাপ্ত ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্ব কখনও মাঝে মাঝে বিষাক্ত সাপেদের মতো টানা হাইবারনেশনে মগ্ন থাকে এবং সুপ্তিকাল কখনও তিন বা চার বছরও দেখা গেছে, অন্তত বড় আকারে 'ফিনিস' ঘটার পর।'

এই বিবাদের 'ঐতিহ্য'-সন্ধানে সিরাজ ফিরে যান ইংরেজ আমলে, যখন জেলাবোর্ডের হাতে থাকা এই পাকা সড়কের উত্তরে ছিল হিন্দুপল্লী, দক্ষিণে মুসলমানপল্লী। দুই পল্লীর নেতৃস্থানীয় ইউসুফ ও প্রাণনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে যখন কারাবরণ করেন, তখন দুই পল্লীর মানুষজনের সম্মিলিত চিৎকারে উঠে এসেছিল ঐক্যের ডাক : 'বন্দে মাতরম্‌! আল্লাহ্‌ আকবর!' আজাদির পর ঐ ইউসুফ আর প্রাণনাথই আবার একত্রে স্লোগান দিয়েছিলেন, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়'। তারপর দক্ষিণডিহিতে অনেক রদবদল ঘটেছে, বদল ঘটেছে মূল্যবোধেরও।

> 'সেই প্রাণনাথ, বৃদ্ধ কিন্তু তখনও প্রাণবন্ত, আজাদিটি ক্রমে সত্য সাব্যস্ত করেন, কারণ চোখের সামনে নেপোরা দই মেরে দিচ্ছিল, তিনি ভোটে জেতেন এবং তাঁর পার্টি সরকার গড়লে স্বহস্তে উদ্বাস্তুদের পাট্টা বিলি করেন।'

এই 'বিপ্লবী' পুরুষের মৃত্যুর পর তাঁর 'পপুলারিটির নির্ব্যূঢ় স্বত্ব' দখল করলেন উত্তরাধিকারীরাই— প্রথমে আইনজীবী পুত্র বীরেন্দ্র, 'বিরেংবাবু'; পরে তস্য পুত্র নকশাল আন্দোলন করে রাতারাতি 'মাফিয়া লিডার' বনে যাওয়া শুভ্রাংশু ওরফে 'ছোটন'। রাজনীতিতে বিরেংবাবু বা ছোটনের প্রতিপক্ষ প্রাক্তন-জমিদার হরি সিংয়ের পুত্র অরিজিৎ বা অরু সিং, যিনি দু-তিনবার 'রাজভক্তিহেতু' ভোটে জিতেছিলেন, বর্তমানে পরাজয় জেনেও তবু দাঁড়ান। ক্ষমতা কায়েম রাখতে দু'পক্ষই জড়ো করেছে আশ্রয়ভোগী দুষ্কৃতীদের— ডাঙ্গাপাড়ার

নিয়ন্ত্রণ ছোটনের ডান হাত পান্না হোসেনের, নামুপাড়া রয়েছে হারুনের খাসদখলে।

> 'মৌজা দক্ষিণডিহির এই দক্ষিণাংশে নৈসর্গিক স্বাধীনতা— সেখানে রাষ্ট্র নেই, সরকার নেই, পুলিশ ও সেনাবাহিনী নেই। এমন কী কোনও কোনও বাবু ওই প্রলম্বিত পল্লীটিকে সকৌতুকে 'মিনি পাকিস্তান' বলে বর্ণনা করতেন। ...উত্তরাংশে হাইওয়ের দুধারে বাজারে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস অধুনা, ...তারা সংঘর্ষ ও রক্তপাতগুলিন, ঘড়পোড়া ছাইগুলিন এনজয় করে।'

উচ্চবিত্তের উন্নাসিকতায় যা উপভোগ্য, নিম্নবিত্ত মুসলিম জনমানসে তার পরিণতি কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সিরাজ এ উপন্যাসের পরতে পরতে তা উদ্‌ঘাটিত করে চলেন। বিরেংবাবু, ছোটন বা অরু সিংহেরা ভদ্র সামাজিকতার আপাতশোভন স্তরেই বিরাজ করেন। শহরে তাদের সাজানো বাড়ি, মডার্ন গ্যাজেট, বিলেতি শিক্ষার আড়ালে প্রমোদকক্ষে চলে ব্লু-ফিল্মে 'শতাধিক মৈথুনরীতির ডেমনস্ট্রেশন'। এই বিত্তায়ন ও দুর্বৃত্তায়নের বৃত্তে এসে পড়ে গহ্বর আলির মতো ধনী ব্যবসায়ী : 'ধূর্তামিতে উপর্যুপরি ব্যাঙ্ক এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর থেকে এত লোন ও গ্রান্ট জোটাল যে, এখন সে হাইওয়ের ধারে খন্দ ও পাটব্যবসায়ী' বনে গেছে। ক্ষমতাতন্ত্র আর হত্যার রাজনৈতিক চক্রে একদিন খুন হয়ে গেল পান্না। এই 'জানমারি'র মাঝে সুস্থতা ও পাগলামির সন্ধিকালে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে সদাহাস্য সোনারু— যে বলে, 'আমি গরমেন হলে ...আইন লেখে দিতাম জানমারি বন্ধ।' স্রোতের বিপরীতে হাঁটা এই ঈশ্বরপ্রতিম মানুষটি সকলের চোখে ছিল 'চোইত পাগল'। সে আপন মনে গান গাইত 'ইসা পৈগাম্বার বোলে/এহি দুনিয়ার তলে/সকলের রএেছে গো ঘর... /আমি মৈরমের ব্যাটা/আমার নাই চাটিপাটা/আমার ঘর দুনিয়া সংসার।' উপন্যাসের শেষে জানমারিরা সোনারুকেও 'ফিনিস' করে দেয়। ইসা পয়গম্বরের আসমানে লীন হয়ে যাওয়ার ইসলামি মিথের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ জেসাসের রূপকল্পকে মিলিয়ে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় সিরাজ রূপায়িত করেন এই মৃত্যুদৃশ্যকে :

> 'গোরস্তানে প্রোথিত আড়কাঠাটি— যা প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রুশদণ্ড, ঝলসে যাচ্ছিল, আর অঝোর ধারায় ভিজছিল এবং প্রভাকরের কামারশালে জরুরি হুকুমে তৈরি তীক্ষ্ণাগ্র আট ইঞ্চি পেরেকগুলিনের প্রথমটি বিদ্ধ হলে সে, সোনারু, চোইতপাগল, ...এতক্ষণে যথাযথ মরিয়মপুত্রে পরিণত এবং অত্যদ্ভুত দুর্বোধ্য সুপ্রাচীন ভাষায় আর্ত চিৎকার করেছিল, 'এলি এলি লামা সা-বাক্তানি'। ...সহসা শিমুল গাছটির মাথায় বজ্রাঘাত, দাউ দাউ জ্বলে ওঠে, আর মসজিদের জাপানি ঘড়িটিতে তখন নটা বাজল।...
>
> And about the ninth hour
> Jesus cried with a loud voice,
> Eli Eli Lama sa-bakthani,
> My God, my God, why hast thou
> Forsaken me?... (*St. Mathew 27 : 46*)'

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, ঊর্ধ্বলোকে চলে যাচ্ছে এক মানবপুত্র; হানাহানির জানমারি থেকে শুদ্ধ, পবিত্র, অনন্ত শমের দিকে আলোকিত হয়ে যাচ্ছিল তার যাত্রাপথ!

অলীক মানুষ-এ দেবনারায়ণের জবানিতে সিরাজ বলেছিলেন, 'মুসলমান ধর্মে যার জন্ম, তার তিনটে কালচার। ইসলামি কালচার, পারিপার্শ্বিক হিন্দু কালচার আর শিক্ষাসূত্রে লব্ধ পাশ্চাত্য কালচার'। আমাদের মনে হয়, শুধু *অলীক মানুষ* বলে নয়, সিরাজের উপন্যাস আলোচনায় সামগ্রিকভাবে এই তিন সংস্কৃতির সংশ্লেষণ মনে রাখা খুব জরুরি। কেননা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি যে মুসলিম অধিগঠনকে ছুঁতে চান, সেখানে মিথ-ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-লোকসংস্কৃতি— সব মিলিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে যৌথমানসের অবয়ব। জন্মগতভাবে ধর্মত মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন শাখায় তাঁর ব্যাপক ও বিচিত্র অধ্যয়ন এবং লোক-অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছে ধর্মনির্লিপ্ত কিন্তু বিচারশীল। ইতিহাস-সচেতন মানুষ হিসেবে তিনি জানেন, বাঙালি মুসলমানেরা ছিল প্রথম থেকেই নির্যাতিত এক জনগোষ্ঠী। তার প্রধান কারণ এই যে, বাঙালি মুসলমান আদতে রূপান্তরিত মুসলমান; মধ্যযুগে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্মের কড়াকড়ি এবং ইসলামি শাসনতন্ত্রে উচ্চপদলাভের আকাঙ্ক্ষায় যারা ধর্মান্তরিত হল, তাদের বড়ো অংশই ছিল অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের হিন্দু। এর ফলে আর্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিশ্বদৃষ্টি এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রসারিত বোধ ছিল, তা অনুভব করার প্রেরণা স্বাভাবিকভাবেই তারা পায়নি। আবার সেই সঙ্গে এও স্বীকার্য যে, মূল জাতিগত সংস্কারের স্মৃতি এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মন থেকে সম্পূর্ণ মোছেনি বলেই, পৌত্তলিকতা(বুতপরোস্তি) যা ইসলামবিরোধী, তা মুসলিম নিম্নবর্গে থেকে গেছে। এই সংশ্লেষণের ফলেই এ দেশের মুসলিমদের মধ্যে হিন্দুসমাজের আদলে রয়ে গেছে জাতিবিভাজন। সিরাজ তাঁর উপন্যাসে দেখান আশরাফ-আতরাফ নামের দুটি বড়ো বিভাজন ছাড়াও মুসলিম সমাজে প্রচলিত আজলাফ-শেফ-অর্জল প্রভৃতি বর্গচ্যুতির নিদর্শন। *রেশমির আত্মচরিত*-এ এই বিভাজন সম্পর্কে সিরাজ জানিয়েছেন :

> 'বাইরে থেকে এদেশে যেসব মুসলমান এসেছিলেন, তাঁদের বংশধররা আশরাফ। আর এদেশের যারা মুসলিম হয়েছিলেন, তারা আতরাফ। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হল, দুনিয়ার অন্য কোনও দেশে এমন কোনও ভেদ নেই। তার মানে, হিন্দুদের উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের দেখাদেখি এদেশে মুসলিমরা এটা করেছে। ...কোনও মুসলমানের পয়সাকড়ি হলে এবং লেখাপড়াটা শিখলেই নিজেকে আশরাফ ঘোষণা করে। নামের পাশে সৈয়দ, কাজি, খোন্দকার এসব বসিয়ে দেয়।'

সব মিলিয়ে দেখা যাবে, এ দেশের মুসলিমরা হয়তো ব্যুৎপত্তিগতভাবেই মূল স্রোতের বাইরে আত্মতার স্বেচ্ছাবৃত্তে মুখ লুকিয়েছে। এর পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর উন্নাসিকতা যেমন দায়ী, তেমনি মুসলিম সমাজে বহু যুগ ধরে জমে থাকা ধর্মীয় অন্ধতা ও অশিক্ষাপ্রসূত

হীনমন্যতাও এর অন্যতম কারণ। সিরাজ জানেন, যাপিত জীবনের এই অভিমান এবং অন্তরাল সরিয়ে মুসলিম অধিগঠনের উৎসে পৌঁছতে গেলে যেতে হবে ইতিহাসের বাঁধা সড়কের বাইরে, সমাজবিদ্যা-নৃতত্ত্ব ও লোকায়ত উদ্ভাসে গড়া সমান্তরাল বিকল্প পথে। সেই আলো-আঁধারি প্রদেশের জটিল অন্বেষণে অতীত থেকে আধুনিকতায় ছড়ানো সিরাজের যাত্রাপথ।

সহায়ক রচনা

১. অলীক মানুষ : লোকায়তের মিথ— সুধীর চক্রবর্তী, *পরিকথা*, মে ২০০০।

২. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও বাংলা সাহিত্য— জয়শ্রী দে, *সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ১৪০৫।

৩. অলীক মানুষ : সৌন্দর্য ও বিষাদের প্রতিমা নির্মাণ— বিপুল দাস, *উত্তরধ্বনি*, শারদ সংখ্যা ১৪০৯।

ঋতংকর মুখোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৮১ সালে কলকাতায়। স্কুলজীবন কেটেছে বীরভূমের সিউড়িতে। ২০০৫-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করে বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে লিখেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধ। অনুসন্ধিৎসু, গবেষক ঋতংকরের লেখার অন্তর্বয়নে অনুধ্যানের সৌকর্য স্পষ্ট বিম্বিত হয়।